।। প্রথম অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আর্বিভাব, সমকালীন প্রেক্ষাপট ও বাংলা সাহিত্য

সময় ও সমাজ পরিবর্তনের ধারা ব্যক্তির মানসিকতা, জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের পরির্বতন ঘটায়, আর ব্যক্তির এই পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ছায়াপাত ঘটে সেই সময়ে রচিত কথাসাহিত্যে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা ছোটগল্পের সঙ্গে সমকালীন জীবনের সর্ম্পক একান্ত ঘন নিবদ্ধ কারণ ছোটগল্পে কাল সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় সুস্পষ্টরূপে। লেখকের ভাবলোককে প্রভাবিত করে সমকাল আর শিল্পির তথা লেখকের ভাবলোক জন্ম দেয় গল্পের জীবনভূমিকে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আর ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় 'মৃত্যু ও জীবন' গল্পটি রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখক হিসাবে গড়ে উঠবার কালটি (১৯১৬-১৯৩৬) ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সময়টিও বিভিন্ন কারণেই বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। সাহিত্য জগতে তাঁর আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বে উনিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের নতুন সাহিত্য প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে শুরু হয়েছে 'কল্লোল' ও 'কলিকলমে'র যুগ। বাংলা সাহিত্যের এই ভিন্নমুখী প্রবর্তনার মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রবিরোধিতা ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ আনয়ন। সুগভীর দেহোত্তীর্ণ প্রেমচেতনার পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ দেহকামনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম, সংশয় ও সঙ্কটের জটিল রূপবিন্যাস, সমাজের নীচতম তলার 'অবজ্ঞাত অপজাত' মানুষের কাহিনির রূপায়ণ এবং মানুষের অদিম প্রবৃত্তির লীলার উদ্‌ঘাটনে বাংলা কথাসাহিত্য তখন আলোড়িত। বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখা থেকে এই সময়ের সাহিত্যের দিক নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন — " বাহ্যিক অবস্থার ওলোট-পালোট হলে চিন্তাজগতেও কিছু না কিছু বিল্পব আসতে বাধ্য। বর্তমান বাঙ্গালীর চিন্তাধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে যে তাদের সম্পূর্ণ disillusionment - এসে গেছে। আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি। অন্ধভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই; আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালোবাসা – এ তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।"[১]

বুদ্ধদেব বসু বাহ্যিক অবস্থার যে 'ওলোট পালোট' কে সমকালীন চিন্তাজগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলির সূত্রপাত অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় তাদের সূচনা বহু পূর্বেই ঘটেছিল। এসবের অভিঘাত ও পরবর্তী বিপরীত অভিঘাতের ফলাফলই এই 'ওলোট-পালোট'। এর সূচনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) থেকে। এরপর ক্রমান্বয়ে ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪),

রুশ বিপ্লব (১৯১৭), মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯), প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, নিদারুণ খাদ্য ও বস্ত্রসংকট, নিষ্ঠুর দমনমূলক রাওলাট আইনের প্রবর্তন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)— প্রভৃতি ঘটনা। এই সমস্ত ঘটনা দেশের জনসমাজে এক প্রবল হতাশা, অনিশ্চয়তা,অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। এই সময়েরই প্রতিনিধিত্ব ক'রে জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯০৩), প্রেমেন্দ্রমিত্র (জন্ম ১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) প্রমুখেরা প্রকাশ করেছেন 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩)। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠা সাহিত্য আন্দোলনের যুগই 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। সমালোচক তৎকালীন সময়ের ঘটনাবলী ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন সম্পর্কে বলেন— "যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয়- জীবনে নানা বিপর্যয় ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের তথা বাঙলার যুবচিত্ত অশান্ত, বিহ্বল ও হতাশ হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। সেই জিজ্ঞাসা সংশয় ও হতাশার ছবি এই শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের কথাসাহিত্যে ফুটে উঠেছে।"[২]

আমাদের আলোচ্য গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পকার হিসাবে আবির্ভাব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, সুতরাং এক অগ্নিগর্ভ সময়ে সাহিত্য জগতে তাঁর পদার্পণ। তাই তাঁর রচনার প্রেক্ষাপট ও আর্বিভাব কালের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণস্থান দখল করে তাঁর সময়কাল। তাঁর লেখক হয়ে গড়ে উঠার ইতিহাস পর্যালোচনায় তাই তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার ক'রে আছে।

পূর্বে উল্লেখিত বুদ্ধদেব বসু কথিত 'ওলোট-পালটে'র সূচনার বিচারে একটু পিছনে ফিরে তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই সবচেয়ে বড় ঘটনা বঙ্গভঙ্গ ও তৎসঞ্জাত গণআন্দোলনের সূত্রপাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায়। জাতীয় চেতনার বিকাশ ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রণী ভূমিকাতে চিন্তিত চতুর রাজনীতিবিদ কার্জন বঙ্গ-বিভাগ ক'রে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করার সুচতুর রাজনৈতিক প্রয়াস করেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সরকারী ভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহি বিভাগ (দার্জিলিং বাদে), মালদা জেলা এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হবে। এর ফলে আসামের নতুন নাম হবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের দিন স্থির হয়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সরকারী যুক্তি ছিল যে, বাংলার ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে এর পিছনে কাজ করেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুগভীর রাজনৈতিক স্বার্থ। ভারত সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ.এইচ. রিজলির ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখের দুটি চিঠিতে ইংরেজ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে— "Bengal united is a power; Bengal devided will pull in several different ways. Our main object is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule."[৩]

বাংলার ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও বয়কট এবং স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান অন্যতম। বাহ্যত অর্থনৈতিক চরিত্রের হলেও এই স্বদেশি আন্দোলন অচিরেই সমগ্র ভারতবাসীর গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও ছড়িয়ে প'রে এই স্বদেশি বয়কট আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করে। যেদিন বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ হয় অর্থাৎ ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর, সেদিন বঙ্গভঙ্গ দিবস হিসাবে প্রদেশের সর্বত্র শোকদিবস পালিত হয়। কলকাতায় সেদিন এক বিরাট বিক্ষোভের পর এক বিশাল শোভাযাত্রা গঙ্গাতীরে পৌঁছয় এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মাতৃভুমিকে পুনরায় সংযুক্ত করার শপথ গ্রহণ করা হয়। সে দিন শহরের দোকানপাট বন্ধ থাকে, গৃহে গৃহে অরন্ধন পালিত হয় এবং রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এই আন্দোলন কোন বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি আন্দোনের এই বছরগুলিতে বাঙালির যেন নবজন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলনের আহ্বানে দেশের যুব সম্প্রদায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ সাধনের ব্রতগ্রহণ করেছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) প্রমুখের জন্ম এই ১৯০৫ সালের কাছাকাছি সময়ে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় আর ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের কারণে এবং মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র দেশ হিসেবে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বাধ্য করে। ভারতীয় সৈন্য ও অর্থ যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। যুদ্ধের প্রারম্ভে দেশীয় নেতৃবর্গের আশা ছিল, যুদ্ধে যোগদান ক'রলে ব্রিটেন কৃতজ্ঞতাবশে ভারতবাসীকে স্বরাজদান করবে। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় বছরেও এর কোনো সম্ভাবনা দেখা না গেলে অ্যানি বেসান্ত ও পরে বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরাজ লাভের দাবিতে হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন যা ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুনরায় চাঙ্গা করে তোলে ও আন্দোলনে

গতি সঞ্চার করে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। এত আন্দোলনের পরেও কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতবাসী স্বরাজ লাভ করেনি বরং ভারতবর্ষের মানুষ লাভ করে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থনৈতিক ভাবে ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে দুর্বল ক'রে তুলেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতা, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব বাংলা তথা ভারতবাসীকে এক কঠোর নিষ্পষণে পীড়িত করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের 'Indian Annual Registar' থেকে এই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়— "Large numbers were thrown out of work. The working class could not support their families, people died from starvation , women committed suicide for nekedness."[৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার মেটাবার দায়ভার বিট্রিশরা চাপিয়ে দিয়েছিল ভারতের উপর। এক প্রবল শোষণের দ্বারা সামরিক ব্যয়ের দাবি মেটাতে নাভিশ্বাস উঠেছিল সাধারণ ভারতবাসীর। যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত বিশ্বজুড়েই চলছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট। শিল্প সম্পর্কযুক্ত ফসলের রপ্তানি হ্রাসে যেমন কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি জমিদার ও মহাজনেরা কৃষকদের উপর শোষণ বৃদ্ধি ক'রে নিজেদের ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধ সমকালে ও তার পরবর্তী কালে কৃষক ও ক্ষুদ্রশিল্পের কারিগর ও শ্রমিক সম্প্রদায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধশেষে যুদ্ধ সংলগ্ন উৎপাদন বন্ধের ফলে দেখা যায় ব্যাপক কর্মী ছাটাই ও তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির ধর্মঘট। ১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯২০-১৯২১ এই দুই বছর শষ্যহানি ও শষ্য উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শস্য রপ্তানি বহাল থাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে মহামারি রূপে দেখা দেয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে। এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

এর পূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব ও জারের পতন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তীব্রতর করবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। একদিকে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন সময়ে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী সচেতনতার প্রসারে ব্রিটিশেরা শঙ্কান্বিত হয়েছিল।অপরদিকে ভারতীয় নেতৃবর্গ যুদ্ধে সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ স্বরাজ লাভের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করেন ১৯১৯- এর সংস্কার আইন যা মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন নামে খ্যাত। এই আইনের দ্বারা শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচক মণ্ডলীর কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কিন্তু এই সংস্কার আইনের ফলে

প্রশাসনিক কাঠামোয় কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। দ্বৈতশাসনের ফলে প্রদেশেও প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই ছিল সংরক্ষিত, সেই বিষয়গুলিতে গভর্নরই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ভারতবাসীর আশাভঙ্গের ফলে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ নির্বাচন বয়কট করে। এই অসন্তোষ নিয়ে আসে প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এই সময় যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করে কুখ্যাত রাওলাট আইন। এই আইনের বলে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে যে কোন ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে বন্দী করা যেত। বিনা পরোয়ানায় যে কোন ব্যক্তির গৃহ তল্লাশি করা যেত এবং যে কোনো ব্যক্তির গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেত। এই আইনে রাজনৈতিক বিচারের জন্য পৃথক বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা হয়, এই বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতনা, এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করা হয়। এই আইনের প্রতিবাদে সমগ্র ভারতে গণ- আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গান্ধীজি 'সত্যাগ্রহ' ও অহিংস গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সমগ্র ভরতবর্ষ জুড়ে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ফলে ব্রিটিশবিরোধী তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ছিল (১৯২০-২২) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সময়ের পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ও তার পরবর্তী সময়েও ভারতবর্ষ ছিল উত্তাল সমরাঙ্গন বিশেষ। যেখানে একে একে যোগ হয়েছে বিভিন্ন উদ্দীপক যেমন - সাইমন কমিশন, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (প্রারম্ভ ১৯৩৯), আগস্ট বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)।

৪০ এর দশক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই পালাবদলগুলির সর্বশেষ ফললাভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ তেমন ক'রে ভারতবর্ষের গায়ে লাগেনি কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের জনসাধারণের তেমন প্রত্যক্ষ যোগ সেই যুদ্ধের সঙ্গে ছিল না। তথাপি যে যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষের উপরেও কিছু মাত্রায় পড়েছিল। এই প্রভাবের নিদর্শন— শুধুমাত্র ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গঠিত Bengal Battalion। যুদ্ধে ইংরেজ সহায়তার পরিবর্তে ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের সম্ভবনা শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। স্বরাজের পরিবর্তে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল স্বায়ত্ব শাসন, যাকে নজরুল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন— "পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস' ('আমার কৈফিয়ৎ')। তবে যাইহোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ভারতবর্ষের বুকে প্রগাঢ়তর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মূল কারণ। হিটলার জার্মানে

শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে ধ্বংস করার ফলে সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শক্তিও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতিকে ঘোরালো ক'রে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও সূচনার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেন — "আন্তর্জাতিক দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করলে দেখা যায় যে এই যুদ্ধের মূলসূত্রটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। যদিও জার্মানী, ইতালি ও জাপান এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই এই যুদ্ধের সূচনা, তথাপি এর সঙ্গে নবজাত সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা যুক্ত হয়ে যুদ্ধের গতিকে করে তুলেছিল তীব্র এবং জটিল। জার্মানিতে যখন হিটলার শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে ধ্বংস করলেন তখন সারা পৃথিবীতে ভারসাম্য পাল্টে গেল এবং ফ্যাসীবিরোধী মনোভাবের চেতনা বাড়তে লাগল। প্রকৃত বিরোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রথমত ধনতান্ত্রিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত বিরোধিতা বজায় রেখে, মিউনিক চুক্তির মাধ্যমে ফ্যাসীজোট কে তোষণ করার নীতি চালাতে লাগল। কিন্তু হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর এই তোষণ নীতি বজায় রাখা আর সম্ভব হল না এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর আকারে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ।

প্রথম দিকে এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল মিত্রশক্তি অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এবং অক্ষশক্তি অর্থাৎ জার্মানি, জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর এ যুদ্ধ বিস্তৃত আকার ধারণ করল এবং পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি এ যুদ্ধকে ফ্যাসীবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ রূপে ঘোষণা করল ।"[৫]

এমন একটি সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক যুদ্ধ ভারতবর্ষের বুকেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজের হাতের পুতুলমাত্র। ফলে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির যোগদানের পরই তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এই যুদ্ধে ভারতের যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেন। এই সিদ্ধান্তের পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে । এই আন্দোলনের পিছনে ছিল ব্যাপক গণ সমর্থন । নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যে সব দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল,তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের বুকেই এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণ সমর্থন লাভ করেছিল ।

১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টি এই যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করবার বিষয়টিকে শর্ত সাপেক্ষ করে তুললেন । কংগ্রেস ব্রিটিশদের এই যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য করবার জন্য, ইংরেজ সরকার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার করা, সংবিধান সভা আহ্বান করা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণে ভারতীয় রাজনৈতিক

দলগুলির অধিকার স্বীকার,অবিলম্বে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার গঠন প্রভৃতি শর্ত স্থাপন করে। অপর প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগও তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব আইনসভা গুলিতে থাকবে এই শর্তে ইংরেজদের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করেছিল। একমাত্র এদেশের দেশিয় রাজন্যবর্গ , সামন্ত ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিই ব্রিটিশ সরকারের এই যুদ্ধোদ্যোগকে নিঃশর্তে সমর্থন করেছিল।

কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাব বা দাবীগুলির জবাবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে এবং তাতে ঐ দাবীগুলিকে পরোক্ষে অগ্রাহ্য করে। এই শ্বেতপত্রের প্রতিবাদে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে ১৯৩৯ সালের আক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। ইতিহাসকার লেখেন— "কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃঢ় পদক্ষেপ তখন জায়মান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নতুন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং ফলত, ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে নতুন প্রস্তাব উপস্থাপনে বাধ্য হয়েছিল।"[৬]

ফলে চাপে পড়ে ১৯৪০ এর ১০ই জানুয়ারি তৎকালীন বোম্বাইয়ের একটি বক্তৃতায় ভাইসরয় লিন্‌লিথগো বলেন যে যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং আরও ত্রিশ বছর দেশরক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটেনের হাতেই থাকবে। এই ঘোষণায় যেহেতু দায়িত্বশীল সরকার গঠন সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবীর কোন সুস্পষ্ট উত্তর ছিল না ফলে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেনি।

মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই), কানপুর, পাটনা প্রভৃতি বেশ কিছু স্থানের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই । এই বছরে মোট ১১০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে ১লক্ষ ৭০ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। এই শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির হয়ে উঠেছিল আর এই শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে নরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করেছেন, এই প্রসঙ্গে 'অপঘাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮), 'শোক' (১৩৫৪), 'ক্রৌঞ্চমিথুন' (চৈত্র, ১৩৫২) প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

১৯৩৯-৪০ সালে মোট ধর্মঘট ও তাতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ও মোট বিনষ্ট কার্যদিবসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই সময় শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম আরও তীব্রতা লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তর পরিস্থিতি যখন এইভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন ১৯৪০ এর শেষদিকে পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির সাফল্য ব্রিটিশদের সামরিক অবস্থান তথা রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করেছিল

এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯৪০ এর অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। যুদ্ধ বিরোধীতা ও শান্তির সমর্থন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রিটিশদের চরম দমন নীতির ফলে এই আন্দোলন সফল হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে নাৎসি জার্মানরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগদান করলে যুদ্ধের প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪১ এর জুন মাসে। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির ভাবধারায় ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং তারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করবার আহ্বান জানায় এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতাকে সমর্থন করে না। এই সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভিতরে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠলেও যুদ্ধে অক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়নি বা যুদ্ধের আতঙ্ক জনমানসে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষদিকে জাপান সরকার এই যুদ্ধে যোগদান করলে ব্রিটিশদের এশীয় উপনিবেশগুলির উপর যুদ্ধের আক্রমণের ছায়াপাত ঘটে। ১৯৪২ এর ২৮শে জানুয়ারি জাপানিরা ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন দখল ক'রে নেয়। জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ক'রে দখল ক'রে নেওয়ার ফলে যুদ্ধ ভারতের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। ব্রহ্মদেশ দখলের পর জাপান ভারত অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমাবর্ষণ করে।

এই সময়ে লেখা নরেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে কলকাতায় বোমা বর্ষণের সংবাদ পাওয়া যায়। ৩,এফ. নিবেদিতা লেন থেকে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে লেখা চিঠিতে স্ত্রী শোভনাদেবীকে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "বোমা শেষ পর্যন্ত পড়লই কলকাতায়, অবশ্য এখনও ঠিক মাথার উপর নয়, এপাশে ওপাশে, কলকাতার শহরতলির এখানে-ওখানে কিছু বোমাবর্ষণ হয়েছে এ খবর ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে বোধহয় পেয়েছ। পরশু রবিবার রাত্রে প্রথম আরম্ভ হয়।"[৭] নরেন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন ২২শে ডিসেম্বর আর বোমাবর্ষণে শুরু হয়েছে 'পরশু' অর্থাৎ ২ দিন আগে অর্থাৎ ২০ শে ডিসেম্বর। এই চিঠিতেই অন্যত্র তিনি নিজের যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে সেই সময়ের কলকাতার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়— "কাল রাত্রেও সাইরেন বাজল রাত সাড়ে তিনটায় এবং পাঁচ মিনিট পরেই বোমাবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাল অবশ্য বাসাতেই ছিলাম। নিচের বৈঠকখানা ঘরে সবাই মিলে গিয়ে বসলাম। গোটা চারেক শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। প্রত্যেক বারই জানলা দরজা কেঁপে উঠেছিল। ... সকালে কাগজে কালকে রাত্রের খবর কিছু বার হয়নি দেখলাম। কোথায় কী হল বলা যাচ্ছে না। তবে শহরে নয় শহরতলিতেই পড়েছে এটা ঠিক। এ-যাত্রাও মাথা বাঁচল। শব্দ যা শোনা গেছে এখান থেকে, তা কিন্তু তত দারুণ নয়। বহুদূর থেকে শোনা বাজীর আওয়াজের মতো।"[৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে চল্লিশের দশকের এই উত্তাল ও উত্তপ্ত যুদ্ধ ও বিক্ষোভময় পরিস্থিতিতে

নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটাচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় তিনি চাকরীর সন্ধান করেছেন ও লেখালিখির মাধ্যমেও উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক এখন আবার তৎকালীন ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এই সময় জাপানের আক্রমণ, ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজয় – দেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপ প্রভৃতি সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল।

১৯৪১ এর ডিসেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকারী অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ১৯৪২ এর মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে বিশেষ দূত হিসাবে ভারতে পাঠান। ক্রিপস্ নতুন ব্রিটিশ প্রস্তাব সহ ভারতে আসেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়— যুদ্ধকালে ভারতবর্ষে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে এবং যুদ্ধ শেষে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে আর এই পরিষদ ডোমিনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। এছাড়া কতকগুলি প্রদেশ ও এলাকা স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারবে।

এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমবেত বিরোধিতায় প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও উভয় দলের প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশকে খণ্ড খণ্ড করে বিভক্ত করার ব্রিটিশ চক্রান্ত এই ক্রিপস প্রস্তাবেই প্রথম সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল।

১৯৪২ এর এপ্রিলে 'হরিজন' পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী 'ভারতছাড়ো' স্লোগানটি উত্থাপন করেন। ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দানের আহ্বানই ছিল এই স্লোগান। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধা বৈঠকে এই ভারতছাড়ো দাবিটি অনুমোদিত হয় এবং এই প্রস্তাবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়। ৪২ এর আগষ্টে বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন প্রারম্ভের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের দুদিনের মধ্যে ইংরেজ সরকার গান্ধীজী সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করে এবং কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যকলাপ ও সংগঠনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে।

একদিকে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত ভারতবাসী, অপরদিকে জাতীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারি এই দুইয়ের যোগে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ দেখা দেয় এবং নেতৃত্ববিহীন এই জনরোষবহ্নি কেবল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধর্মঘটে আটকে না থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত সকলের যোগদানে এই বিদ্রোহ জাতীয় গণ –আন্দোলনের রূপ নেয়। যুবকেরা এই সময় রেলস্টেশন, পোস্ট–অফিস, থানা প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ চালায়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটাতে পুল উড়িয়ে দেয়। কোথাও কোথাও পুলিশ কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ঘটে। এই সকল বিষয় নরেন্দ্রনাথের

বেশ কিছু ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শোক' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বের গণ-আন্দোলন গল্পটির পটভূমি রূপে অঙ্কিত হয়েছে। যাইহোক প্রকৃত পক্ষে এই বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সমন্বয় ছিলনা। অতি স্বল্প অস্ত্রধারী এই বিদ্রোহীদের দ্বারা ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়নি। এই প্রতিরোধ ছিল অসম। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চরম দমননীতি দ্বারা আন্দোলনকারীদের দমন করে। ২ হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারী প্রাণ হারায় এবং প্রায় ৬০ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই 'আগস্ট আন্দোলন' ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ব্রিটিশদের ভীত করেছিল, অপরদিকে ভারতবাসী সশস্ত্র সংগ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল।

এরই মধ্যে ১৯৪৩ এর ২৮ শে মার্চ ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার শেষ হয় এবং ২৪শে এপ্রিল নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই সময় দেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অজন্মা, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায় বন্যা, অক্টোবরে উপকূল অঞ্চলে বন্যা ও সর্বোপরি ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বন্টনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ সরকারের চরম ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশে প্রচুর সৈন্যের আগমন ও ব্রহ্মদেশে থেকে আগত নিঃস্ব-কপর্দকশূন্য ভারতীয়দের আগমনের ফলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ে।ব্রহ্মদেশে জাপানিদের আক্রমণের ফলে সে দেশ থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে যায় উপরন্তু সে দেশ থেকে আসে প্রচুর শরণার্থী। অপর দিকে ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদের জন্য আতিরিক্ত খাদ্য শস্য মজুত করে এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রেলপথে সামরিক প্রয়োজনের বস্তু ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে শস্য ঘাটতি হয়, অপর দিকে অন্য অঞ্চল থেকে শস্য আমদানি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অজন্মা সত্ত্বেও এই অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য রপ্তানি অব্যাহত থাকে। এই সময় বড় বড় ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে বিভিন্ন স্থান থেকে চাল সংগ্রহ ক'রে এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম আকাশ ছোঁয়া হয় এবং তারপর মূল্য প্রদান করেও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই মনুষ্য নির্মিত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বাঙালি পরিবারগুলিতে ভাঙন দেখা দেয়, একমুঠো অন্নের আশায় সকলে শহরমুখী হয় আর শহরে দেখা দেয় বীভৎস ক্ষুধার জগৎ – মৃত্যুমিছিল। এই অরাজক পরিস্থিতির কালে নরেন্দ্রনাথ বাস করতেন কলকাতার ৩,এফ. নিবেদিতা লেনে। এখান থেকেই স্ত্রী শোভনা দেবীকে ২১শে মার্চ, ১৯৪৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন – "অন্নবস্ত্রের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতায় দেশে হাহাকার উঠল অবস্থা ক্রমেই আরও বেশি খারাপ হচ্ছে। এক বিরাট দুর্বোধ্য নাট্যের সামনে আমরা শুধু বিমূঢ় দর্শক মাত্র।

তবু কী দেখছি তাও ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।"[৯]

১৩৫০ সালের এই মন্বন্তরের সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে চাল রপ্তানির কাজ করেছিল গ্রাম-গ্রামান্তরের মহিলারা। পুলিশের চোখ এড়িয়ে তারা শহরের বাড়িতে বাড়িতে চাল পৌঁছে কিছু মুনাফা করত। 'ব্লাকমার্কেটিং' – এর এই চিত্র ফুটে উঠেছে নরেন্দ্রনাথের 'রসাভাস' গল্পে। যেখানে পদ্মমনি, কুমুদিনী, প্রভৃতিরা এই চাল ব্যবসায়ের অবৈধ কারাবারের সঙ্গে যুক্ত। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে— "গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তাদের মতই গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিদের কাছ থেকে সস্তায় ভাল চাল কিনে শহরের বউ-ঝিদের কাছে গিয়ে বিক্রি করে আসতে হয়। কোন কোন সময় দ্বিগুন তিনগুণ লাভ থাকে। যাতায়াতে রেলভাড়া লাগে আনা ছয়েক, সতর্কভাবে মা কালীগঙ্গার নাম নিয়ে গেটটা পার হতে পারলেই হয়। ব্যস, তারপর আর ভয় নেই। কেবল মাঝে মাঝে এই গোয়েন্দাদের উৎপাত সহ্য করতে হয়। কাউকে কাউকে সিকিটা দু'আনিটা ফেলে দিলেই চলে। কারো বা লোভ আরো বেশি। তাদের হাতে ধরা পড়লে একেক দিন তিন দিনের লাভ পর্যন্ত রেখে যেতে হয়।"[১০] এইভাবে দেখা যায় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই 'রসাভাস' গল্পে লেখক তার সমকাল চেতনাকে অনুপুঙ্খতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষেরও অধিক মানুষ প্রাণ হারায়। বাংলা ও পূর্ব ভারতের বিরাট অংশে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের মতই আরেক ভয়াবহ ও কলঙ্কজনক ঘটনা ১৯৪৪ সালের বস্ত্র সংকট। মুনাফালোভী কালোবাজারীদের অসাধু চক্রান্তে বাংলাদেশে প্রবল বস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছিল। খাদ্য সংকটের মতই প্রবল আকার ধারণ করেছিল এই বস্ত্র সংকট। ন্যূনতম লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রেরও আকাল দেখা দিয়েছিল এই সময়। নগ্ন-বিবস্ত্র নরনারীর ক্রন্দনে সভ্যতার ইতিহাস কালিমালিপ্ত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতা ও সদিচ্ছার অভাবেই এই সংকট এমন তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। বাংলার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল এই সংকট মোকাবিলায় জনসমাবেশ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত করেছিলেন এবং ১০ই মার্চ তারিখকে 'বস্ত্রসংকট দিন' হিসাবে পালন করেছিলেন। সাহিত্যিক মহলও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' প্রভৃতি ছোট গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ' গল্পেও আমরা এই বস্ত্র সংকট কালের চিত্র পাই। ১৯৪৪ এ প্রকাশিত এই 'আবরণ' গল্পে প্রবল বস্ত্র সংকট ও বাজার থেকে কাপড় উধাও হয়ে যাবার বিষয়টি স্বল্পপরিসরে হলেও যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে— "কাঠ ফাটা রোদে মাইল আড়াই রাস্তা পাড়ি দিয়ে বংশী গুপিগঞ্জে এসে পৌঁছল। গত হাটবারেও শহরের সব দোকানে বংশী একখানা কাপড়ের জন্য প্রায় মাথা কোটাকুটি করেছে। রাগ করে ভেবেছে আর আসব না, কিন্তু না এসে উপায় কি ! কাপড় আজ জোটাতেই হবে।"[১১]

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ এই সময়কালে দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। দেশের সকল স্তরের মানুষই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মঘট আন্দোলনে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রামে ছাত্র ও অন্যান্য স্তরের মানুষও স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। ইতিহাসকার লেখেন – "১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভগুলি প্রায়ই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ লাভ করেছিল।"[১২] শ্রমিক শ্রেণির এই আন্দোলনের চিত্র, ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ছবি নরেন্দ্রনাথের 'ক্রৌঞ্চমিথুন' গল্পে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গল্পের নায়ক মন্মথের মৃত্যু হয়েছে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়ে – "রাত প্রায় দুপুরের সময় পাড়ার জন কয়েক ছাত্র আর মন্মথদের কারখানার কয়েকজন কারিগর মিলে নিয়ে এল মন্মথকে। পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।"[১৩] গল্পটিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগের বিষয়টিও পরোক্ষে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এই সকল আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত চরিত্রের পরিচয়টিও গল্পে পরিস্ফুট, যেখানে দেখা যায় মন্মথ নিছক কৌতূহলবশত যোগদান করলেও শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে। গল্প থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে — "অসহায় ভীরুর মতো মরেনি মন্মথ। মরেছে পুরুষের মতো, বীরের মতো। মরবার আগে একটা সার্জেন্টকে ঘায়েল করে গেছে। প্রথমে মন্মথ খানিকটা কৌতূহল নিয়েই ঢুকেছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখছিল ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তারপর চোখের সামনে পুলিশের গুলিতে একজন তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ল মন্মথের মনে কৌতুকবোধ আর রইল না। জনতার সঙ্গে মিশে সেও ইঁটের পর ইঁট ছুড়তে লাগল পুলিশের ওপর। অদ্ভুত তার হাতের তাক, কব্জির এমন জোর সাধারণত দেখা যায় না।"[১৪]

শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ঘটনাও সে সময় দেশের অভ্যন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯৪৫ এর নভেম্বরে দিল্লীতে সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র অফিসারদের বিচার। সুভাষ চন্দ্র বসু সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে ব্রিটিশ সামরিক ট্রাইবুনালের দ্বারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ শাহ্ নওয়াজ খান এবং আরও দুজন আফিসারের দীর্ঘ কারাদণ্ডের ঘোষণায় সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিচার চলাকালীনই দেশের লোক আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা সম্বন্ধে জানতে পারে ও সচেতন হয়। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আফিসারদের কারাদণ্ডের সংবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের জোয়ার নামে। বিশেষ ক'রে কলকাতায় প্রতিবাদ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কলকাতায় বিক্ষোভ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং এই বিক্ষোভ আন্দোলনে শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, অফিস কর্মচারী সকলেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে যোগদান

করেছিল। পরিবহণ ও পুরকর্মচারীরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় শহরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। ২২শে নভেম্বর থেকে ২৫ শে নভেম্বরের মধ্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে বহু বিক্ষোভকারী নিহত ও আহত হয়েছিলেন।

১৯৪৬ এর বিক্ষোভ বিদ্রোহের আরেকটি বড় ঘটনা হল নৌবিদ্রোহ। নাবিকদের বিভিন্ন অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহের সূচনা হলেও ক্রমে তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয় ।

এইভাবে একের পর এক বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছিল স্বাধীন হবার পথে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল দেশবিভাগের মত দুঃখজনক ঘটনার মধ্যদিয়ে। এই দেশবিভাগ ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি সমগ্র চল্লিশের দশককে উত্তপ্ত করে রেখেছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম দিকের গল্পে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে এই দেশবিভাগের চিত্র, দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষদের কঠোর জীবনসংগ্রামের চিত্র আর দেশ বিভাগের পরেও স্বদেশেই থেকে যাওয়া মানুষের কাহিনি। এর সঙ্গেই ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ছবিও। 'হেডমাস্টার', 'পালঙ্ক' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি দেশবিভাগের জীবন্ত চিত্ররূপের সাক্ষ্য হিসেবে বর্তমান। দেশভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলেখ্য তাই নরেন্দ্রনাথের দেশকালকে চিনে নেবার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশভাগ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, নিজে একজন উদ্বাস্তু হবার ফলে তিনি এই দেশভাগজনিত বেদনাকে অন্তরের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। তিনি এই অধ্যায়ে বর্ণিত উত্তাল সময়কে খুব কাছের থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন কারণ তখন তিনি এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি নিজেও খুব সুখে নেই, কারণ তখন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় রত। আর্থিক স্বচ্ছলতা আহরণের জন্য কখনও চাকুরি খুঁজছেন, কখনও ছাত্র পড়াচ্ছেন আর একই সঙ্গে নিরন্তর গল্প কবিতা লিখে যাচ্ছেন যার কিছু কিছু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতও হচ্ছে। এই সময়ে তাঁর লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর এই সময়ের জীবন সংগ্রাম ও দেশের অবস্থা এই দুয়েরই কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখে নিবেদিতা লেন থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন— "ভাঙ্গা থেকে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ দিয়েছে। চাকরি আর রাখা গেল না। ওদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেছে। এখন যে- কোনওদিন নোটিশ দিয়ে দিলেই হয়। অন্য খোঁজখবর করছি। চাকরি একটা জুটবে,যখনই হোক। তবে মাঝখানে আবার হয় তো কিছুদিন চলবে সেই বেকার জীবন। কলকাতার রৌদ্রতপ্ত পদপথ, ক্ষয়িষ্ণু শুকতলা আর সস্তা রেস্টুরেন্টের হাফ কাপ চা।"[১৫] অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নরেন্দ্রনাথের জীবন সংগ্রাম অন্তত চল্লিশের দশকে পাশাপাশিই চলে ছিল। এই সময়ের উত্তাল অবস্থা, বিক্ষোভ,আন্দোলন ,ধর্মঘট— অন্যান্য সকলের মত কাল-সচেতন তাকেও স্পর্শ ও প্রভাবিত করেছিল। তার ব্যক্তিগত পত্রে এই সময়ের স্পর্শ বর্তমান — "... শুনেছ

বোধহয়, কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে। অফিসে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়।... ভিড়ের জন্য বাসে ওঠা যায়না।... আজ থেকে বাস ধর্মঘটও শুরু হলো।"[১৬]

নরেন্দ্রনাথের নিজের মন মানসিকতা ছিল রোম্যান্টিক কিন্তু তৎকালীন দেশের উত্তেজক অবস্থা তাকে ভীষণভাবেই প্রভাবিত করেছিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি এই সংকটজনক অবস্থা থেকে। দেশের অবস্থা তাঁকেও ভাবিত করে তুলেছিল আর বিচ্যুত করেছিল তাঁর নিজের মানসিক জগত থেকে। স্ত্রীকে লেখা পত্রে তাঁর উদ্বেগ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে— ".... ফুল আর ছন্দ থেকে মনটা স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। নোয়াখালীর কথা খবরের কাগজে পাচ্ছ। আজ গুজব শুনলাম মাদারীপুর অঞ্চলেও দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য কিছুটা খোঁজখবর নেওয়ার পর খবরটা মিথ্যা গুজবই মনে হচ্ছে। সত্য হওয়াও বিচিত্র নয়। দেশব্যাপী এই মূঢ়তার কথা স্মরণ ক'রে মন অত্যন্ত ব্যাকুল এবং উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।" (কলকাতা, ৪ কার্ত্তিক ১৩৫৩, সন্ধ্যা সাতটা)

এই দাঙ্গার চিত্র ঠিক প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অনেকটা বাস্তবতাতেই ' পতাকা' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পতাকা' গল্পে প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী শচীবিলাস যখন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিন গ্রামের মুসলমান জনগনের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা পেয়েছেন তখন সেই সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পময় পরিবেশে শচীবিলাসের কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার কথা মনে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের সেই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে শচীবিলাসের আত্মভাষণে উঠে এসেছে সেই সময়কার চিত্র— "কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানদের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ্য করে নানা রকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে আবডালে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালী দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িক ভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ গাঁকেও রক্ষা করা গেল না। হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত দিন সর্তক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে। এক হাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আর এক হাতে উত্তেজিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হাত ধরেছেন। যে জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে শুরু করেছে। কৌতুকে কৌতূহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে আবার হঠাৎ একি বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ কোন সূচনা দেখা দিল

আজ।"[১৭]

অতএব দেখা যায় এই অধ্যায়ে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা একটি বিষয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে সপ্রমান করে যে, নরেন্দ্রনাথ এক উত্তাল আন্দোলনের কালে জন্মগ্রণন করেন এবং নিজের বাল্য, কৈশোর ও প্রাক্ যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। পরশুরামের গল্পসমগ্রের ভূমিকায় শ্রী প্রমথনাথ বিশী লেখেন— "লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েকবছর তাকে গঠন করে তোলে।"[১৮] এই অধ্যায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও শৈশবের কালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটি কেমন ছিল। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা শহরের নিকটবর্তী সদরদি গ্রামে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ কতটা প্রভাব ফেলেছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কিছুটা বড় হবার পর বিশেষত শহর কলকাতার অধিবাসী হবার পর নরেন্দ্রনাথের মননে যে এই রাজনৈতিক আন্দোলন তার প্রত্যক্ষতার কারণেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাঁর রচিত পত্রসমূহ ও ছোটগল্পগুলি থেকেই। সমালোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের বিশ্লেষণে মনে হয় যে প্রখর কালসচেতন গল্পকার হওয়া সত্ত্বেও সমকাল চেতনা নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ নয়।"[১৯]

একথা হয়ত সর্বাংশে মিথ্যে নয় কারণ 'পতাকা', 'শোক', 'বিষাদযোগ', প্রভৃতি কয়েকটি হাতে গোনা গল্প ছাড়া রাজনৈতিক ঘটনা বা সংঘাতের গল্প তাঁর সুবিশাল ছোটগল্পের ভাণ্ডারে স্থান লাভ করেনি। এক বিক্ষুব্ধ সময়ে অবস্থান করে তিনি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মূক' – এ বিষয় হিসেবে চয়ন করেছেন রোম্যান্টিক মনের মাধুরীকে। প্রেমাস্পদের সামনে দাঁড়িয়ে এক বাক্যহারা প্রেমিকের হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন কবিতায়। এ থেকে তাঁর হৃদয়ের অন্তর্লীন রোম্যান্টিক মানসিকতার পরিচয়ই পরিস্ফুট। কিন্তু সমকাল তাঁর কবিতার মূল বা একমাত্র বিষয় না হয়ে উঠলেও সমকালচেতনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর ছোটগল্পের ছত্রে ছত্রে। অনেকক্ষেত্রেই তা সোচ্চার নয় কিন্তু মনোযোগী পাঠকের তা দৃষ্টি এড়ায় না। দেশভাগ এই কারণে তাঁর অনেক গল্পের পটভূমিকে রচনা করেছে, গল্পের চরিত্রদের প্রভাবিত করেছে। 'হেডমাস্টার', 'কাঠগোলাপ', 'দ্বিচারিণী' প্রভৃতি গল্পের কথা এখানে এ কারণে বিশেষ উল্লেখ্য। আবার আরও গভীরতর উপলব্ধিতে 'চোর' গল্পটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। যেখানে গল্পের বিষয় বা মূল ঘটনাধারায় সমকাল হয়তো ছায়াপাত করেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না কিন্তু গল্পের মূল চরিত্র অমূল্য যে এই সময়ের ফসল তা মরমী পাঠকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। এমনকি তার যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠবার পথে তার পত্নী রেণুর যে পরিবর্তন তাও এক অবক্ষয়িত সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই আলোচক লেখেন— "অমূল্য তার সময়ের শিকার। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – সমকালীন অবক্ষয়িত পরিবার ও সমাজের, বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থার পঙ্গু পরিবেশে চিহ্নিত।

... স্পষ্টত রেণু যুদ্ধ–সমকালের ক্রমিক অবক্ষয়ে আক্রান্ত হওয়ার উপযোগী এক সাংসারিক বধূ শ্রেণীর চরিত্র।"[২০] প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধানতম শর্তই হল সমাজ–বাস্তবতা। কিন্তু যেহেতু সেই বাস্তবতা মানবিকতার রসে জারিত তাই তাঁর গল্পের সমকালচেতনা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি যে তাঁর সমকাল সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, তা তাঁর ছোটগল্পে কীভাবে সময়কে তুলে এনেছেন, সময়ের সমস্যা ও তদ্‌জনিত প্রতিক্রিয়াকে রূপদান করেছেন তা বিশ্লেষণ করলেই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই কারণেই সমালোচক বলেন, — "বিশ শতকের চল্লিশের দশক ধরে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যতগুলি গল্প লিখেছেন, দেশকালের দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর গল্পকার – ব্যক্তিত্ব এমন সময়ের কালো ছায়া নিয়েই ছোটগল্পগুলিতে ধরা পড়ে।"[২১]

উল্লেখপঞ্জি

১. বুদ্ধদেব বসু ঃ 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', 'কল্লোল' চৈত্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ। 'প্রগতি' মাসিকপত্র থেকে 'কল্লোল' পত্রিকায় সংগ্রহকৃত।

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ 'দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬

৩. 'রিজলির পত্র' — 'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', Sumit Sarkar, People's Publishing House, March 1977, Page-17,18.

৪. সূত্র— রামেশ্বর শ ঃ 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস' (১ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-৬০

৫. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী) ঃ 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষপেটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০),' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৮

৬. গিগ্রোরি কতোভ্স্কি ঃ 'সাম্প্রতিক ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৬, অনুবাদক-দ্বিজেন শর্মা, পৃষ্ঠা-৬০৪.

৭. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩১.

৮. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩১.

৯. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩২.

১০. 'রসাভাস'- 'গল্পমালা-৪' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৬.

১১. 'আবরণ'- 'গল্পমালা-৩' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৩২.

১২. গ্রিগোরি কতোভ্স্কি ঃ 'সাম্প্রতিক ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', কোকা আন্তোনর্ভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ- লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৬, অনুবাদক-দ্বিজেন শর্মা, পৃষ্ঠা-৬০৪.

১৩. 'ক্রৌঞ্চমিথুন', গল্পমালা-৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৭.

১৪. তদেব , পৃষ্ঠা-১৭.

১৫. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩৩.

NBU. DARJEELING LIBRARY

220129

26 JUL 2010

১৬. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩৪.

১৭. 'পতাকা'- 'গল্পমালা-৩', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫.

১৮. প্রমথ নাথ বিশী ঃ ভূমিকা-'পরশুরামের গল্পসমগ্র', এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১

১৯. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৫৬.

২০. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৫৬.

২১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৯.